ডাকগাড়ি

(গল্পগ্রন্থ – জন্ম ও মৃত্যু)

এক এক সময় রাধা ভাবে, কোথাও বেড়াইয়া আসিতে পারিলে ভালো হইত। আজছ'বছরের মধ্যে সে একখানা দুর্গা প্রতিমার মুখ পর্যন্ত দেখে নাই। এ গাঁয়ে সবাই গরিব, দুর্গোৎসব তো দূরের কথা, তেমন একটা জাঁকের কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা পর্যন্ত হয় না। অবশ্য এ গাঁয়েরই সে মেয়ে, এই অবস্থার মধ্যেই মানুষ হইয়াছে, বাল্যে সে ভাবিত সর্বত্রই বুঝি এই রকম ব্যাপার। কিন্তু বিয়ের পর বাসুদেবপুর গিয়া রাধা প্রথম বুঝিল, তাদের গাঁ অতি হীন অবস্থার গাঁ। গরিব আর বড়লোকে তফাত কি, বুঝিল।বাসুদেবপুর এমন কিছু শহর বাজার নয়, গঙ্গার ধারে একখানা বর্ধিষ্ণু গ্রাম এই পর্যন্ত।সেখানে মুস্তাফিরা বড় লোক, এমন পূজা নাই যে, তাদের বাড়ি হইত না—দুর্গোৎসব বল, শ্যামা পূজা বল, জগদ্ধাত্রী পূজা বল, এমন কি রথ পর্যন্ত।

বছর তিনেক বড়ই আনন্দে কাটিয়াছিল—সব দিক দিয়াই।

তারপর তাহার স্বামী মারা গেল যকৃতের রোগে। শাশুড়ির সঙ্গে রাধার বনিল না, দিনকতক উভয়ের মধ্যে যে সব বাক্যাবলীর আদান-প্রদান চলিল, তাহাকে ঠিক সদয় ও ভদ্রবাক্য বলা চলে না। রাধা প্রমাণ করিতে ব্যস্ত হইল, তাহার বাবা এত দরিদ্রআজও হন নাই যে, তাহাকে একবেলা এক মুষ্টি আতপ চালের ভাত দিয়া পুষিতেপারিবেন না। ফলে একদিন একটি মাত্র পুঁটলি সম্বল করিয়া রাধা তাহার ছোট ভাইয়েরসঙ্গে বাপের বাড়ি আসিয়া পৌঁছিল। ভাইটিকে সে-ই পত্র লিখিয়া আনিয়াছিল। তাহার তোরঙ্গ ও ক্যাশবাক্স শাশুড়ি আটকাইয়া রাখিলেন।

ছ' বছর তারপর কাটিয়া গিয়াছে।

সেই যে বিধবা হইয়া আসিয়া বাপের বাড়ি ঢুকিয়াছে, আর সে গ্রাম হইতে বাহিরহয় নাই।

এই ছ'বছরে অনেক কিছু ঘটিয়া গেল তাহাদের সংসারে। বাবা লেখাপড়া ভালোজানেন না, বিশ্বাসদের পাটের আড়তে কাজ করিয়া সামান্য কয়েকটি টাকা পাইতেন।বাবার সে চাকুরিটা গেল। রাধার ছোট একটা ভাই গেল মারা। বাবা বাত হইয়া কিছুদিনশয্যাগত থাকিলেন। বাবার সঙ্গে মায়ের মনোমালিন্যের সূত্রপাত হইল। ক্রমে উভয়েরমধ্যে সামান্য কথায় ঝগড়া বিবাদ হইতে লাগিল। জমিদার নালিশ করিয়া তাহাদের বড় জমা ক্রোক করিয়া লইল, ইত্যাদি ইত্যাদি।

একঘেয়ে হইয়া পড়িয়াছে দিনগুলি, সেই সংসারের কাজ, সেই গরুর সেবা, সেইরাঁধাবাড়া, বাবার হাতে পায়ে তেল মালিশ করা, মায়ের দোক্তার পাতা পুড়াইয়া তামাক তৈরি করা, কলের মতো একটানা একঘেয়ে ভাবে চলিতেছে দিনের পর দিন, মাসেরপর মাস।

আজ সকালে ডোবার ধারে বাসন মাজিতে বসিয়া তাই সে ভাবিতেছিল, একবারকোথাও বেড়াইয়া আসিবে।

ছোট ডোবাটা। চারি পাড়ে বড় বড় গাছের ছায়ায় ঝুপসি অন্ধকার হইয়া আছে। দুপুর বেলাতেও রোদ পড়ে না। এইটুকু তো ডোবা, এর আবার চারিদিকে চারিটা ঘাট।বাঁধানো নয়, কাঁচা ঘাট। দক্ষিণ দিকের জামতলায় জেলে পাড়ার ঘাট, পশ্চিম পাড়েরবেলতলায় নাপিতদের ঘাট, পুবদিকে বামুনপাড়ার ঘাট, উত্তর পাড়ে যাদের জমিতেডোবাটা তাঁদের ঘাট। তাঁরাও ব্রাহ্মণ, নিজেদের জন্যে একটা ঘাট আলাদা রাখিয়াছেন, কাহাকেও সে ঘাটে যাইতে দেন না।

সেই বাড়িরই মেয়ে সুবি, ভালো নাম সুবিনীতা—তাদের ঘাটে চায়ের পাত্র ধুইতে নামিল। গ্রামের মধ্যে ওরা ওরই মধ্যে একটু শৌখিন, চা খাওয়ার অভ্যাস রাখে, সুবিকিছুদিন কলিকাতায় কাকার বাসায় থাকিয়া পড়িত। ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়িয়া পড়াছাড়িয়া দিয়া আজ বছর খানেক বাড়িতে বসিয়া আছে। গ্রামের মেয়েদের মধ্যে তারপ্রভাব ও প্রতিপত্তি খুবই বেশি, কারণ গ্রামের মধ্যে সে-ই একমাত্র মেয়ে,যে স্কুলের মুখ দেখিয়াছে—তাও আবার কলিকাতায়। সুবি দেখিতে মোটামুটি ভালোই, রং উজ্জ্বলশ্যাম, বড় বড় চোখ, একরাশ কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, সর্বদা ফিটফাট হইয়া থাকে, একটু চালবাজ। ষোল বছর বয়েস, বিবাহের চেষ্টা চলিতেছে। রাধা সুবি বলিতে অজ্ঞান, কিন্তু সুবি তাকে বড় একটা আমল দেয় না। গরিব ঘরের মেয়ে, বাইশ তেইশ বছর বয়েস, তার ওপরে বিধবা এবং লেখাপড়াও তেমন কিছু জানে না—এ অবস্থায় রাধা কি করিয়া আশা করিতে পারে যে,

সে কলিকাতার স্কুলের ক্লাস এইট্ পর্যন্ত পড়া মেয়েসুবির অন্তরঙ্গ মণ্ডলীতে স্থান পাইবে! তা সে পারে না—বা সে আশা করা তারউচিতও নয়।

সুবিকে জলে নামিতে দেখিয়া রাধার মুখ ঠিক আগ্রহে ও আশায় উজ্জ্বল দেখাইল। সে বলিল—ও সুবি ভাই, তোদের চা খাওয়া হয়ে গেল?

সুবি কচুর ঝাড়ের গোড়া হইতে চায়ের পেয়ালা লইয়া জল বুলাইতে বুলাইতে বলিল—হয়নি। মার তো আজ সোমবার, মা খাবে না—শুধুআমি আর যাদু।তাড়াতাড়ি নেই, এবার গিয়ে জল চড়াব।

সুবি নিজে থেকে কোনো কথা বড় একটা রাধার সঙ্গে বলে না—তবে রাধা যেকথা জিজ্ঞাসা করে, ভদ্রভাবে তার উত্তর দেয়।

রাধা জানে সুবি সাংসারিক কথাবার্তা বলিতে ভালবাসে না। পড়াশুনা, গান, ফিল্ম, কবিতা প্রভৃতি তাহার কথাবার্তার বিষয়। কলিকাতায় থাকিয়া তাহার রুচি বদলাইয়াগিয়াছে।

রাধা তাহার মন যোগাইয়া চলিবার চেষ্টায় বলিল—কাল সন্ধ্যেবেলা তুই এলিনেভাই, আমি কতক্ষণ বসে বসে একটা কবিতা মুখে মুখে বানালাম। তোকে শোনাব আজ দুপুরে।

—কি কবিতা?

—আসিস, এখন না। শোনাব। মুখস্থ নেই, ভাই।

সুবি আর কোন আগ্রহ দেখাইল না। শুধু বলিল—দুপুরে মা কাঁথা সেলাই করবে, আমাকে কাছে বসে সুঁচে সুতো পরাতে হবে। আমার যাওয়া তো হবে না।

রাধা বলিল—সেই গানটা একটু গা না সুবি?

সুবি চায়ের পাত্রগুলি হাতে লইয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত অবস্থায় বলিল—এখনসময় নেই। অনেক কাজ। চলি।

রাধা অতি করুণ মিনতির সুরে বলিল—গা না ভাই, দুটো লাইন গা। বলচি এতকরে—

বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, পাড়াগাঁয়ের মেয়ের তুলনায় সুবি গান গাহিতে পারে মন্দনয়। কলিকাতায় থাকিবার সময় নিধুদা'র কাছে সে অনেক গান শিখিয়াছিল। নিধুদাতার কাকীমার পিসতুতো ভাইয়ের ছেলে। কলেজে পড়ে, বেশ গান গাহিতে পারে, চেহারাও ভালো। সুবিকে দিনকতক সে গান শিখাইতে ঘন ঘন আসিত।

সুবি গুন্‌গুন্ করিয়া মাত্র দু' কলি গাহিল—

যৌবন সরসী-নীরে

মিলন শতদল

কোন চঞ্চল বন্যায় টলমল টলমল!

ঠিক এই সময় নাপিতদের ঘাটে নাপিত-বৌ এক কাঁড়ি বাসন লইয়া মাজিতেআসিল। নাপিত-বৌ শ্যামবর্ণ, বয়স উনিশ-কুড়ি, খুব সুন্দর নিটোল গড়ন, স্বাস্থ্যবতী, মুখশ্রীর মধ্যে একটা সুলভ ও সহজ সৌন্দর্য আছে—অর্থাৎ যে শ্রীটা এই বয়সেই থাকে, পাঁচ বছর পরে যাহার আর বিশেষ কিছু অস্তিত্ব থাকিবে না। কিন্তু এখন যখন সেটা আছে, তখন খুব জমকালো ভাবেই আসর মাতাইয়া রাখিয়াছে।

নাপিত-বৌ সুবিকে প্রায় পূজা করিয়া থাকে মনে মনে। তাহার জীবনে এমন মেয়েসে দেখে নাই। অমন রূপ, অমন কথাবার্তা, অমন লেখাপড়া, অমন গান—সকলদিকেই সুবি নাপিত-বৌয়ের মন হরণ করিয়া লইয়াছে। যে পাড়াগাঁয়ে নাপিত-বৌয়েরবাপের বাড়ি, সে গাঁয়ে এমন একটি মেয়ের কল্পনাও করা শক্ত। ইহার সঙ্গে আলাপপরিচয়ের সুযোগ পাইয়া সে ধন্য হইয়া গিয়াছে। নাপিত-বৌ আঁচলের চাবিটা শক্তকরিয়া গেরো দিতে দিতে সুবির দিকে প্রশংসমান দৃষ্টিতে চাহিয়া গান শুনিতে লাগিল।

বলিল—ভারি চমৎকার গলা দিদিমণি আপনার। কখনো এমন শুনিনি, কি গানটাদিদিমণি?

সুবি পদগুলি আবৃত্তি করিয়া গানটি বলিয়া গেল।

নাপিত-বৌ গানের ভাষা বিন্দুবিসর্গও বুঝিল না। সুবির মন যোগাইবার জন্য একমনে শুনিবার ভান করিয়া মাঝে মাঝে ঘাড় নাড়িতে লাগিল।

সুবি ভাবিতেছিল, এ বর্বরদের গান শুনাইয়া লাভ কি? আজকাল তাহার গলাসত্যিই ভালো হইয়াছে। নিধুদা যদি শুনিত! ..

আর কলিকাতায় যাওয়া হইবে না...নিধুদা'র সঙ্গে দেখাও আর হইবে না। তাহারবিবাহের সম্বন্ধ খোঁজা চলিতেছে, স্কুল ছাড়াইয়া আনিয়া বাড়িতে রাখা হইয়াছে। বয়স ষোল ছাড়াইয়া চলিল কিনা! আর বাড়ির বাহির হইবার হুকুম নাই। কলিকাতা.... চিত্রা...রূপবাণী কেতকী শোভা, নিধুদা...সব স্বপ্ন...এ জন্মের মত সব ফুরাইয়াছে... সোনার স্বপ্ন ভাঙিয়া গিয়াছে। আশ্চর্য নয় যে, তেইশ বছরের বিধবা রাধার ঘনিষ্ঠতা তাহার ভালো লাগে না। নাপিত-বৌ তাহার পায়ের তলায় পোষা কুকুরের মতো পড়িয়া থাকে, কোনো রকমে সহ্য করিয়া থাকিতে হয়। ঝি-চাকরকেও তো লোকে সহ্যকরে।

রাধা বলিল—ভাই সুবি, তোর গলাখানা যদি একবার পেতাম! হিংসে হয় সত্যি।

সুবি নাপিত-বৌয়ের খোশামোদ ও রাধার গায়ে পড়িয়া আলাপ জমানোর চেষ্টাঠেলিয়া ফেলিয়া চায়ের পাত্র লইয়া চলিয়া গেল। সে মরিতেছে নিজের জ্বালায়, এমনসময় এ-সব ন্যাকা ন্যাকা কথা তাহার ভালো লাগে না।

জেলেপাড়ার ঘাটে ছিপছিপে, ফরসা, থান-পরা জেলে-বৌ কাপড় কাচিতে নামিল।

রাধা বলিল—ও রামুর মা, রামুর কোনো খবর পেলে?

জেলে-বৌ বলিল—কোথায় দিদিঠাকরুন—আজ পাঁচ মাস ছেলে গিয়েচে, একখানাপত্তর নয়—টাকা পাঠানো চুলোয় যাক—তার টাকা পাঠাতে হবে না। আমি ধান ভেনে, ক্ষার কেচে, গতর খাটিয়ে যেমন চালাচ্চি, এমনি চালিয়ে যেতে পারলে বাঁচি।ছেলের রোজগার খেতে চাইনে, সে ভালো থাকুক, নিজের খরচ নিজে করুক, তাতেইআমি খুশি। কিন্তু বলো তো দিদিঠাকরুন, একখানা চিঠি নেই আজ পাঁচ মাস, আমি কি করে ঘরে থাকি?

রামু লালমণিহাটের রেলে কি একটা চাকরি পাইয়া গিয়াছে। মাকে একবার পাঁচটিটাকা পাঠাইয়াছিল—তারপর এখন লেখে যে, সামান্য মাইনেতে তাহার কুলায় না, মাকে এখন আর টাকা পাঠাইতে পারিবে না। মা যেন কষ্ট করিয়া পূজা পর্যন্ত কোনোরকমে চালাইয়া লয়। ছেলের কষ্ট হইবার ভয়ে মাও আর টাকা চায় না। কষ্টে-সৃষ্টেইচালায়।

রাধার জেলে-বৌকে ভালো লাগে বড়।

এমন ধরনের মেয়ে এ গ্রামে ব্রাহ্মণ কায়স্থের ঘরেও নাই। এত সুন্দর মন ওর, পরের উপকারে প্রাণ ঢালিয়া দিতে এমন লোক সত্যিই গাঁয়ে আর নাই।শুধুরাধাদেরবলিয়া নয়, লোকের চিঁড়ে কুটিতে জেলে-বৌ, ধান ভানিতে জেলে-বৌ, যাহাদেরবাড়িতে পুরুষমানুষেরা বিদেশে থাকে, শুধু বাড়িতে মেয়েরা আছে—এক ক্রোশ দূরবর্তীবাজার হইতে তাদের হাট-বাজার করিয়া দিতে জেলে-বৌ, কুটুম্ব-বাড়িতে তত্ত্বতাবাসপাঠাইতে কিংবা নব-বিবাহিতা মেয়ের সঙ্গে শ্বশুরবাড়ী যাইতে জেলে-বৌ—জেলে-বৌ নাহইলে এ গাঁয়ের লোকের চলে না। অথচ এ সবের জন্যে জেলে-বৌ কারো কাছেএকটি পয়সা প্রত্যাশা করে না—পাড়ার পাঁচজনের বিনি পয়সায় বেগার খাটিয়াবেড়ানোই তার অভ্যাস।

গত জ্যৈষ্ঠ মাসে রাধার মনে আছে—আমবাগানের পথ দিয়া সে ঘাটে যাইতেছে—জেলে-বৌ আম কুড়াইতেছে বাগানে।

রাধা বলিল—রামুর মা, আম কুড়ুচ্চ? দেখি কোন্ কোন্ গাছের, ও গুয়োথলীর আম পেয়েচ যে দেখচি! ...ও বাবা, ও তো বড় একটা পাওয়া যায় না। আমি কত খুঁজি, একটাও পাইনে একদিনও। তোমার ভাগ্যি ভালো। ভারি বোঁটা-শক্ত আম, তলায় পড়েই না।

অত মিষ্টি গাছের আম, আর পাওয়া অত শক্ত, মাত্র তিনটি আম পাইয়াছিলজেলে-বৌ, অমনি হাসিমুখে বলিল,—তা নিয়ে যান দিদিঠাকরুন, আম ক'টা আপনিসেবা করবেন। দয়া ক'রে নিয়ে যান আপনি। জেলে-বৌ-এর গুণ আছে, অত সহজেত্যাগ স্বীকার করিতে ওর জুড়ি নাই এ গাঁয়ে।

রাধা আম লইয়াছিল এই জন্য যে, না লইলে জেলে-বৌ ভাবিবে, ছোট জাতেরদান বলিয়া ব্রাহ্মণের মেয়ে সকালবেলা গ্রহণ করিল না। লইয়া সে ভাবিল—জেলে-বৌ-এর আপন-পর জ্ঞান থাকতো যদি, এ গাঁয়ে হাঙ্গামা পোয়াতে হত তা হলে।

রাধা বলিল—জেলে-বৌ, আমার সঙ্গে একবার শ্বশুরবাড়ি চল না? অনেক দিনকোথাও বেরুইনি, ভাবচি দিনকতক ঘুরে আসি।

জেলে-বৌ বলিল—যান না দিদিঠাকরুন। আপনাদের যাবার জায়গা আছে কেন যাবেন না। শ্বশুরবাড়ি যানওনি তো অনেকদিন। তাঁরা দেখলে খুশি হবেন।

সে বিষয়ে রাধার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। শাশুড়ি তাকে দু'চক্ষে দেখিতে পারে না, তা রাধার জানিতে বাকি নাই। তবুও যাইতে হইবে, তোরঙ্গ আর ক্যাশ বাক্সটা সেখানেছাড়িয়া আসায় লাভ কি? সেগুলো আনা দরকার। অমন ভালো তোরঙ্গটা।

পরদিন বাবা-মাকে কথাটা বলিতেই বাড়িতে একপালা ঝগড়া শুরুহইল। রাধারবাবার আদৌ মত নাই সেখানে মেয়ে পাঠাইতে, রাধার মা কিন্তু রাধার দিকে। দু'জনেএই লইয়া বাধিল ঘোরতর দ্বন্দ্ব।

রাধা বাবাকে বলিল, আমি ঘুরে আসব তো বলচি সাত দিনের মধ্যে। নবুকে সঙ্গেনিয়ে যাই—না থাকতে দেয় আসা তোআমার হাতের মুঠোয়। একঘেয়ে ভালো লাগে নাএখানে।

রাধার বাবা বলিলেন—এ অপমান সাধ করে কুড়ুবার কি দরকার তোর? তারা কিএই ছ'বছরের মধ্যে একখানা পত্তর দিয়ে খোঁজ নিয়েচে যে তুমি কেমন আছ?

অনেক কষ্টে অবশেষে বাবাকে নিমরাজী গোছের করাইয়া ছোট ভাইকে সঙ্গে লইয়া রাধা আসিয়া গাংনাপুর স্টেশনে গাড়ি চাপিল।

রেলগাড়িতে চাপিয়া রাধার মনে হইল সে মুক্তির স্বাদ পাইয়াছে বহুদিন পরে। কেবল বাবা মায়ের একঘেয়ে ঝগড়া অশান্তি, কেবল 'নাই নাই' শুনিতে শুনিতে তাহার তরুণ মন অকালে প্রৌঢ়ত্বের দিকে চলিয়াছে। সংসারে আলো নাই, বাতাস নাই, এতটুকু আনন্দ নাই—শুধুই শোনো চাল নাই, কাঠ নাই, একাদশীর আটা কোথা হইতেআসিবে, নবুর কাপড় ছিঁড়িয়া গিয়াছে, নতুন একটা ইজের ছ'আনা হইলে পাওয়া যায়, তা যেন ছ'টি মোহর। নবুর পাঁচ মাসের স্কুলের মাইনে বাকি, দুবেলা মাস্টারে শাসায়, মুখুয্যেদের বাড়ির ঠাকুমার দেনার টাকার সুদের তাগাদা—আর বাবার যত মিথ্যে কথাবানাইয়া বলা পাওনাদার বিদায় করিতে। আজ সে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

রাণাঘাট স্টেশনে গাড়ি বদল করিয়া মুর্শিদাবাদ লাইনের গাড়িতে চাপিতে হইল। মুড়াগাছায় নামিয়া ক্রোশখানেক হাঁটিয়া বৈকাল তিনটার সময় সে শ্বশুরবাড়িতে গিয়া পৌঁছিল।

শাশুড়ি বৌকে দেখিয়া বলিলেন—এই যে নবাবের মেয়ে, তা এতদিন পরে কি মনে করে? সঙ্গে কে? ছোট ভাই—ও, সেই নবু না? এসো এসো বাবা, সুখে থাকো, চিরজীবী হও। তা বেশ ছেলেটি।

কিন্তু শাশুড়ির অমায়িকতা তিনদিনের মধ্যেই ঘুচিয়া গেল। রাধার বিধবা বড় ননদভ্রাতৃবধূকে পুনরায় এ বাড়িতে আসিতে দেখিয়া সন্তুষ্ট হন নাই। রাধার গলার ছ'ভরিরহার সেবার শাশুড়ি কাড়িয়া রাখিয়াছিলেন, সেই হারছড়া ভাঙিয়া ননদের মেয়ের বিয়ের সময় হাতের রুলি আর বালা গড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। বড় ননদ ভাবিয়াছিলেন, আজছ'বছর যে বৌ এ বাড়ি আসে নাই, সে আর আসিবে না। কিন্তু আপদ আবার যখন জুটিল, তখন তো হারের দাবি করিয়া বসিবে। হইলও তাই। রাধা শাশুড়ির কাছে হার চাহিল। শাশুড়ি বলিলেন—তোমার বাবা যে টাকা বিয়েতে দেবেন বলেছিলেন, তা দেননি—দুটো টাকা বাকি ছিল। তার দরুন হার রেখে দিই। সে টাকা নিয়ে এসো আগে, হার এখুনি বার করে দিচ্ছি।

বড় ননদও এই কথায় সায় দিলেন।

রাধা বলিল—বারে, আমার বাবার গড়িয়ে দেওয়া, তোমরা তো আর দাওনি?বাবাটাকা দিয়েছেন কিনা সে তোমরা বোঝ গিয়ে তাঁর সঙ্গে। আমার হার কেন তোমরা দেবে না?

কিন্তু টাকাকড়ির কথা আর কি অত সহজে মেটে!

রাধা বলিল, আমার বাবার দেওয়া তোরঙ্গ, তাই বা তোমরা কেন আটকে রাখবে? আর তোরঙ্গের চাবি ভেঙে তোমরা জিনিসপত্র বার করে নিয়েচ কেন?

শাশুড়ি ও ননদ দুজনে মিলিয়া বলিলেন, চাবি কেহ ভাঙে নাই, ভাঙাই ছিল।

রাধা বলিল, আমার নতুন তোরঙ্গ, চাবি ভাঙা থাকলেই হল? তোমরা ভেঙেচ। যতচোরের ঝাড়, দাও আমার হারছড়া—

শাশুড়ি বলিলেন, মুখ সামলে কথা বলো বৌমা, বলচি—

উভয়পক্ষে তুমুল ঝগড়া বাধিয়া গেল। ননদ মারিতে আসিলেন ভ্রাতৃবধূকে। নবুকে সেদিন আর কেহ খাইতে ডাকিল না। রাধার তো কথাই নাই, তাহাকে কে আদর করিয়াখাওয়াইবে, সে যখন তার বিবাহের হার ও তোরঙ্গ চাহিতে আসিয়াছে!

দুপুরের পরে ঝগড়াঝাঁটি করিয়া নবুকে সঙ্গে লইয়া রাধা ধর্মদহ গ্রাম হইতেমুড়াগাছা স্টেশনে হাঁটিয়া আসিল। দুজনেরই অনাহার। মনে পড়িল এই শ্রাবণ মাস, এই শ্রাবণ মাসেই সে ওই পথেই একদিন পালকি করিয়া নববধূরূপে আসিয়াছিল।কথাটা মনে আসিতেই রাধার চোখে জল বাধা মানিল না। স্টেশনে আসিবার সারা পথটাই সে কাঁদিতে কাঁদিতে আসিল।

ট্রেনটি আসিলে তাহাতে কলের পুতুলের মতো বসিয়া রাধা কত কথা ভাবিতেলাগিল। মিছামিছি প্রায় তিনটি টাকা খরচ হইয়া গেল। এ টাকা অবশ্য তাহার বাপেরবাড়ির নয়—তাহার নিজেরই জমানো টাকা। টাকাটা হাতে থাকিলে টানাটানির সংসারে কত কাজ দিত। বাবার অমতে আসা হইয়াছে, শুধু-হাতে ফিরিলে বাবার বকুনি খাইতে হইবে, মা মুখ ভার করিয়া থাকিবে। ছ'ভরির হারছড়া—লইয়া যাইতে পারিবার আশা করিয়াই সে আসিয়াছিল। বাবা-মায়েরও সে আশা যে একেবারে না ছিল তা নয়। এবার সকলে রাগ করিবে। তা ছাড়া ভবিষ্যতে শ্বশুরবাড়ি আসিবার পথও গেল। শাশুড়িরসঙ্গে ঝগড়া না করিলেই হইত। না হয় গিয়াছেই হারছড়াটা! বাপ মায়ের অবর্তমানেশ্বশুরবাড়িতে একটু দাঁড়াইবার স্থানও তো হইত! তাহার জীবনে কোন সুখ নাই। বাড়ি গিয়া তো সেই একঘেয়ে ব্যাপার। সেই ডোবার ধারে সকালে বাসন মাজা, সেই গোয়ালপরিষ্কার, সেই রাঁধাবাড়া। সুবি—তা সে-ও তেমন মন খুলিয়া কথা কয় না। সে অনেককিছু ভুলিতে পারিত, যদি সুবি তাহার সঙ্গে হাসিয়া আলাপ করিত, প্রাণ খুলিয়ামিশিত। তা করে না—কত করিয়া সাধিয়া কত ভাবে মন যোগাইয়া রাধা দেখিয়াছে।

সত্যি, জীবন সব দিক দিয়াই অন্ধকার। বাঁচিয়া কি সুখ?

কাল সকালে কি হইবে সে বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছে। রাত্রে আজ সে বাড়িফিরিলেই বাবার সঙ্গে মায়ের ঝগড়া বাধিবে। অর্থাৎ সে হার আদায় করিতে না পারিয়াফিরিলেই বাবার আশাভঙ্গের রাগটা গিয়া পড়িবে মা'র উপর, দুজনে ধুন্ধুমার বাধিয়া যাইবে। কাল সকালে ডোবাতে বাসন মাজিবার সময় মুখুয্যে পাড়ার ঘাট, জেলেপাড়ার ঘাটের সবাই জানিতে চাহিবে সে এত শীঘ্র শ্বশুরবাড়ি হইতে ফিরিল কেন? শাশুড়ি কি করিল, কি বলিল—এই কৈফিয়ত দিতে দিতে আর মিথ্যা কথা বানাইয়াবলিতে বলিতে তাহার প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিবে। কারণ সত্যকথা তো সে বলিতে পারিবে না! রায়-বাড়ির কুচুটে মেজ-বৌ মুখ টিপিয়া হাসিবে। সুবি নামিবে ওদেরনিজেদের ঘাটের কচুতলায় চায়ের বাসন ধুইতে। নিজে হইতে একটা কথাও সেজিজ্ঞাসা করিবে না যে, রাধা কবে আসিল বা কিছু। রাধাকে প্রথমে কথা বলিতেহইবে। সুবি দু'একটা 'হাঁ' 'না' গোছের দায়সারা উত্তর দিয়া চায়ের পেয়ালা পিরিচউঠাইয়া লইয়া চলিয়া যাইবে, যেন বেশিক্ষণ ডোবার ঘাটে দাঁড়াইয়া ওর সঙ্গে কথাবলিলে তার আভিজাত্য খর্ব হইয়া যাইবে। বাসন-মাজার পরে ঘাটে যাওয়া, রান্না, খাওয়ানো দাওয়ানো, দুপুরে পান মুখে দিয়াই ছুটিতে হইবে ঘাটে, গরুকে জলখাওয়াইতে সেই নদীর ধারের মাঠে, যেখানে গরুকে গোঁজ পুঁতিয়া রাখিয়া আসাহইয়াছে। সেই সময়টা যা একটু ভালো লাগে— নীল আকাশ, নদীর ধারে কাশ ফুলদোলে, সমস্ত জিউলি গাছের গা বাহিয়া সাদা সাদা মোমবাতিঝরা মোমের মতো আঠা ঝরিয়া পড়ে, হু হু খোলা হাওয়া বয় ওপারের দেয়াড়ের চর হইতে, পাট-বোঝাইগরুর গাড়ির দল ক্যাঁচ ক্যাঁচ করিতে করিতে ঘাটের পথের রাস্তা দিয়া কোথায় যেনযায়। গরুকে জল খাওয়াইয়া আসিয়া তাহার বড় ইচ্ছা করে সুবিদের বাড়িতে সুবির সঙ্গে বসিয়া একটু আধটু গল্প-গুজব করে দু'একখানা বর্ণসূচি পড়িয়া শোনায়—(কারণসে বই পড়িতে জানে না) গান শোনায়—কিন্তু হায় রে দুরাশা! গায়ে পড়িয়া আলাপ জমাইতে গেলে সুবি গভীর ঔদাস্যের সুরে বলিবে—হ্যাঁ, যাই রাধাদি। কত কাজ পড়ে রয়েছে, বিনুর সেই মোজা জোড়াটা বুনতে বুনতে ফেলে রেখেচি, সেটা সম্পূর্ণ শেষকরে ফেলি গিয়ে। বসো তুমি—মা'র সঙ্গে কথা বলো।

তার পর বেলা পড়িয়া যাইবে। রোয়াকে কাস্তে বঁটি পাতিয়া একরাশ বিচুলি কাটতেহইবে গরুকে জাব খাওয়াইতে। মাঠ হইতে গরু অবশ্য মা-ই আনে, কারণ এ সময়টা সে কাজে এত ব্যস্ত থাকে যে, নদীর ধারের মাঠ হইতে গরু আনিবার সময় তার বড়একটা হয় না। তারপর বাইরের বেড়ার গা হইতে শুকনো কাপড় তুলিতে হইবে, ঘর ঝাঁট দিতে হইবে, লণ্ঠনে তেল পুরিয়া কাঁচ মুছিয়া রাখিতে হইবে, গা ধুইয়া আসিতেহইবে, পাতকুয়া তলায় সাঁজ জ্বালিয়াই বাবার মিছরি মরিচ গরম করিয়া দিয়া রাত্রেরভাত চড়াইতে হইবে। সকলের খাওয়া দাওয়া সারা হইলে সে নিজে এক মুঠাচালভাজা তেল-নুন মাখিয়া এক ঘটি জল খাইয়া বাবার পায়ে বাতের তেল মালিশকরিতে বসিবে। এই সব সারিতে রাত সাড়ে দশটার গাড়ি গড়গড় করিয়া মাত্‌লারবিলের পুলের উপর দিয়া যাইবার শব্দ পাওয়া যাইবে।

তবে দিনের মতো ছুটি। এই চলিবে দিনের পর দিন, তিনশো ত্রিশ দিন।

হঠাৎ নবু জানালার বাহিরে হাত বাড়াইয়া আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—উই রাণাঘাটের ইস্টিশান দেখা যাচ্ছে দিদি—

রাধার চমক ভাঙিল।

সে মুখ বাড়াইয়া দেখিল, প্রকাণ্ড ট্রেনটা অজগর সাপের মতো বাঁকিয়া রেলস্টেশনের নিকটবর্তী হইতেছে। যেখানে তার ইঞ্জিন, সেখানে দূরে একটা বড় বাড়ি ও টিনের ছাদ দেওয়া দালান-মতো দেখা যাইতেছে। রাণাঘাট পৌঁছিয়া গেল এর মধ্যে।

প্ল্যাটফর্মে নামিয়াই নবু বলিল—একখানা পাঁউরুটি কিনে দ্যাও না দিদি! কি খিদেইপেয়েছে—ডাক্‌ব?

আঁচলের গেরো খুলিয়া তিনটি পয়সা বাহির করিয়া রাধা ভাইকে একখানা পাঁউরুটিকিনিয়া দিল। তাহার নিজেরও খুব ক্ষুধা পাইয়াছে—সেও তো সারাদিন কিছু খায় নাই। ভাইকে বলিল—আর কিছু খাবি? এক কাজ বরং, চল বাইরের দোকান থেকে আলুরদম কিনে দিই এক পয়সার। পাঁউরুটি দিয়ে খা, পেট ভরবে এখন।

নবু বলিল—তুমি কিছু খাবে না, দিদি?

—আমি রেলের কাপড়ে কি খাব? চা খেতে পারি, ওতে দোষ নেই—যা দিকি ঐচা বিক্রি করচে, জেনে আয় কত করে নেবে এক পেয়ালার দাম।

নবু জানিয়া আসিয়া বলিল—এক পেয়ালা চা চার পয়সা, দিদি।

—উঃ বাবা, চার পয়সা। তবে থাক গে। মোটে আর নটি পয়সা আছে। বাবারজন্য একখানা পাঁউরুটি কিনে নিতে হবে। দুধ দিয়ে পাঁউরুটি খেতে ভালোবাসেন বাবা। মা'র জন্য কি নেব বল্ তো?

রাণাঘাট স্টেশনে দাঁড়াইয়া রাধার মনের দুঃখ অনেকটা চলিয়া গিয়াছে। কত লোক-জন গাড়ি-ঘোড়া, দোকান, পসার—দেখিলে মনে শান্তি পাওয়া যায়।

এমন সময়ে প্ল্যাটফর্মে একটা শব্দ উত্থিত হইল—লোক-জন, পানওয়ালা, পাউরুটিওয়ালারা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। লোক যে যেখানে ছিল দাঁড়াইয়া উঠিল। রাধাএকটি কুলিকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, ডাক-গাড়ি আসিতেছে। দার্জিলিং মেল।

অল্পক্ষণ পরেই সশব্দে বিশাল ট্রেনখানা প্ল্যাটফর্মের ওপ্রান্তে প্রবেশ করিল। সঙ্গেসঙ্গে ভিড়, হাঁকাহাঁকি, লোক-জনের দৌড়াদৌড়ি, পুরি-তরকারি, পান-বিড়ি-সিগারেট, 'কুলি কুলি, ইধার আও', হৈ-হৈ ব্যাপার। স্টেশন সরগরম হইয়া উঠিল; রাধা আর নবুযেখানে দাঁড়াইয়াছিল, তারই সামনে ডাক-গাড়ির প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী কামরাগুলি থামিল।

রাধা অবাক্ হইয়া চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল। ঝকঝক তকতক করিতেছেকামরাগুলি। কি রকম পুরু চামড়ার গদি-আঁটা বেঞ্চি। সাহেব, মেম, মোমের পুতুলের মতো তাদের ছেলেমেয়েরা, দামী শাড়ি-পরা সুন্দরী বাঙালী বড়লোকের মেয়েরা...সুবিকোথায় লাগে এদের কাছে? বেহারারা ট্রের উপর চায়ের জিনিস বসাইয়া ছুটাছুটিকরিতেছে...একটি অতি সুন্দর ছ'সাত বছরের ফ্রক-পরা সাহেবদের মেয়ে প্ল্যাটফর্মে নামিয়া লাফাইতেছিল—তার মা আসিয়া তার হাত ধরিয়া গাড়ির মধ্যে উঠাইয়া লইতে লইতে কি বলিল—হিট্ হিট্ প্রিং প্রিং—কেমন মজার কথা ওদের! ...হাসি পায়শুনিলে। সত্যি কি চমৎকার দেখিতে খুকিটা।

নবু বলিল—এই দিকে এসে দ্যাখো দিদি, আবার গাড়ি।

একখানা খুব বড় লম্বা গাড়ির মধ্যে সারি সারি টেবিল পাতা, টেবিলের উপরধপ্ধপে চাদর, কাঁচের ফুলদানিতে ফুল সাজানো, চকচকে সব কাঁচের বাসন। সাহেব-মেম খাইতে বসিয়াছে। বাঙালীর মেয়েও আছে তাদের মধ্যে। তবে বেশি নয়—দু-একজন। আঠারো উনিশ বছরের একটি বাঙালীর মেয়ে বেশি দামের টিকিটের কামরাহইতে নামিয়া প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াইয়া ফল কিনিতেছে।

রাধা কি দেখিল, কি পাইল জানি না, কিন্তু ডাকগাড়িখানা তার সুশ্রী সুবেশ আরোহীদল ও সুসজ্জিত ঝকঝকে তকতকে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরাগুলি লইয়াতাহার মনে একটি অপূর্ব আনন্দ, উৎসাহ ও উত্তেজনার সৃষ্টি করিল। সমস্ত দার্জিলিং মেলখানা যেন একটি উদ্দীপনাময়ী কবিতা—কিংবা কোনো প্রতিভাবান গায়কের মুখেশোনা সঙ্গীত। রাধার মনে হইল, এই ভালো কাপড়-চোপড়-পরা সুন্দর চেহারার মেয়ে-পুরুষ, বালক-বালিকাদের সে দেখিতে পাইতে পারে—যদি মাত্র ছ' আনা পয়সা খরচকরিয়া রাণাঘাট স্টেশনে আসে। যে পৃথিবীতে এরা আছে, সেখানে তার বাবার বাতের বেদনা, সুবির হৃদয়হীনতা, মায়ের খিটখিটে মেজাজ, বাবা-মায়ের ঝগড়া, শাশুড়ির নিষ্ঠুর ব্যবহার সব ভুলিয়া যাইতে হয়, এমন কি তার ছ'ভরির হারছড়ার লোকসানের ব্যথাও যেন মন হইতে মুছিয়া যায়। কি চমৎকার! দেখিলে জীবন সার্থক হয় বটে, মন ভরিয়া ওঠে বটে। সংসারে এত সুখ, এত রূপ, এত আনন্দও আছে!

পূর্বেই বলিয়াছি, রাধা কি বুঝিল, কি পাইল জানি না কিন্তু একথা খুবই সত্য যে, মেল গাড়িখানা ছাড়িয়া গেলে রাধা দেখিল যে, সে যেন নতুন মানুষ হইয়া গিয়াছে। মনে নতুন উৎসাহ, হাতে পায়ে নতুন বল, চোখে

নতুন ধরনের সৃষ্টি। সে যেন রাধা নয়— যে সংসারে অসহায়, অনাহূত, উপেক্ষিত, অবলম্বনহীন এবং যার শেষ সম্বল ছ'ভরিরহারছড়াটা পর্যন্ত শাশুড়ি ঘুচাইয়া দিয়াছে। একটুখানি সহানুভূতির কথা ও মিষ্টি হাসিরলোভে তাকে কালই ডোবার ঘাটে সুবির অজস্র খোশামোদ করিতে হইবে।

নবুকে বলিল—ওদের কাছ থেকে এক পেয়ালা চা নিয়েই আয় নবু, তুই আর আমিভাগ করে খাই। যাক গে চার পয়সা। আমাদের ট্রেনের এখন অনেক দেরি। ততক্ষণ এক পেয়ালা চা খেয়ে নেওয়া যাক। বাড়ি গিয়ে যেন মা'র কাছে বলিস নে।